

আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইমাম আবু হানীফা ও আল-ফিকহুল আকবর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১৫. ৫. ক্রসেড-তাতার যুদ্ধোত্তর যুগের অবস্থা

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে আমরা কিয়াস, হাদীস, মাযহাব ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা, তাঁর ছাত্রগণ ও প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহগণের বক্তব্য জানতে পারলাম। এগুলি নিশ্চিত করে যে, তাঁদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ভিত্তিহীন। তবে হিজরী পঞ্চম-সপ্তম শতকে ক্রসেড যুদ্ধে বিধ্বস্ত এবং এরপর ৭ম হিজরী শতাব্দীতে তাতার আক্রমণে বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন[1] মুসলিম দেশগুলোতে ইলম চর্চা স্থবির হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সামাজিক সমর্থন খুবই কমে যায়। এ সময়ে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানচর্চায় স্থবিরতা আসে। এ সকল যুগেও অনেক প্রাজ্ঞ আলিম ছিলেন। তবে অধিকাংশ আলিমই জ্ঞানগত দৈন্যে নিপতিত হন। এ সময়ে অনেক হানাফী ফকীহ এমন সব মন্তব্য করেছেন যা হানাফী মাযহাবের এ মৌলিক বিষয়টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে এবং বিরোধীদের অপপ্রচারকে শক্তিশালী করে। সকল মাযহাবেরই একই অবস্থা হয়ে যায়।

এ যুগের ফকীহগণ ইমামগণের কথা ও শতশত বৎসর পরের ফকীহদের কথা সবই “ইমামের মাযহাব” বলে চালাতে থাকেন। বরং ইমামদের কথার চেয়ে পরবর্তী ফকীহদের কথাই বেশি গ্রহণযোগ্য হতে থাকে। এছাড়া মুসতাহাব পর্যায়ের মতভেদকে তারা হালাল-হারাম বানিয়ে ফেলেন। আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ছাত্রগণ বলেছেন যে, মুফতীর জন্য ইমামের মতের দলীল না জেনে ফাতওয়া দেওয়া হারাম। কয়েক শত বৎসর পরে কোনো কোনো আলিম বললেন, দলীল না জানলেও ফাতওয়া দেওয়া জায়েয হতে পারে। আরো কয়েক শত বৎসর পরে কেউ কেউ বলতে লাগলেন: মুকাল্লিদ বা মাযহাব অনুসারীর জন্য দলীল জানাই হারাম!! এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ তুর্কি হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ পীর আলী বারকাবী (৯৮১ হি)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ মুসতাহাব হুসাইনী খাদেমী হানাফী (১১৭৬ হি) বলেন:

دليل المقلد قول المجتهد لا النصوص... إذا تعارض النص وقول الفقهاء يؤخذ بقول الفقهاء إذ يحتمل كون النص اجتهاديا وله معارض قوي وتأويل وتخصيص وناسخ وغيرها مما يختص بمعرفة المجتهد

“কুরআন-হাদীস মুকাল্লিদের দলীল নয়, মুকাল্লিদের দলীল হলো মুজতাহিদের কথা! ... যদি কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট কথা ফকীহদের কথার বিপরীত হয় তবে ফকীহদের কথা গ্রহণ করতে হবে!!! কারণ হতে পারে যে, কুরআন-হাদীসের কথাটি ইজতিহাদী! এর বিপরীতে কোনো শক্তিশালী দলীল বা ব্যাখ্যা আছে যা হয়ত মুজতাহিদ জানতেন!!!”[2]

কী দুর্ভাগ্যজনক কথা! নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকতে তারা এ সকল সম্ভাবনা দিয়ে হাদীসের নির্দেশনা বাতিল করছেন, অথচ অনুরূপ কিছু সম্ভাবনা দিয়ে ইমামের কথা বাতিল করতে রাজি নন! এ তো সাধারণ মুর্থ মানুষদের কথা। আলিম বা মুফতীর জন্য তো ফরয দায়িত্ব এ সম্ভাবনাগুলো নিশ্চিত করা। তিনি তাঁর ইমামের দলীল জানবেন,

বুঝবেন ও প্রমাণ করবেন। বিভিন্ন সম্ভাবনা দিয়ে হাদীস বাতিল করার চেয়ে বিভিন্ন সম্ভাবনা দিয়ে ফকীহের কথা বাতিল করা কি সহজতর নয়? হয়ত ফকীহ হাদীসটি জানতেন না, হয়ত তাঁর ইজতিহাদী ভুল হয়েছিল...

ইমাম আযম বলছেন, আমার মতের দলীল না জানলে তুমি তা অনুসরণ করবে না, বরং তুমি যে দলীলটি জেনেছ তা অনুসরণ করবে। আমার মতের বিপরীতে দলীল প্রমাণিত হলে তা অনুসরণ করবে। আর এরা বলছেন যে, ইমামের মতের দলীল জানাও তোমার জন্য নিষিদ্ধ! হাদীস মানাও তোমার জন্য নিষিদ্ধ!! আমরাও তোমাকে তাঁর মতের দলীলটি খুঁজে দিতে প্রস্তুত নই। বরং আমরা 'ইমামের মত' বলে যে কথাটি তোমাকে জানাচ্ছি তা অন্ধভাবে অনুসরণ করা তোমাদের জন্য ফরয!!!

এ সকল যুগের অবস্থা সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১১৭৬হি) বলেন:

فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصرف لا يميزون الحق من الباطل ولا الجدل عن الاستنباط ... ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليداً وأشد انتزاعاً للامانة من صدور الرجال حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين وبأن - يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون - وإلى الله المشتكى وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان.

“তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো ঢালাও অন্ধ তাকলীদের উপরে লালিত হতে লাগল। তারা হক ও বাতিলের মধ্যে এবং বিতর্ক ও ইলমী গবেষণার মধ্যে পার্থক্য বুঝতো না। ...প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্ম তার পূর্বের প্রজন্ম থেকে অধিকতর ফিতনাগ্রস্ত এবং তাকলীদে আক্রান্ত হতে লাগল। এভাবে মানুষের হৃদয় থেকে তারা আমানত ছিনিয়ে নিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা দীনের বিষয়ে গবেষণা ছেড়ে দিল এবং (কুরআনের ভাষায় প্রাচীন কাফিরদের মত) এ কথা বলেই পরিতৃপ্ত হতে লাগল যে, আমরা আমাদের পিতা-পিতামহ-পূর্বপুরুষদের থেকে এ ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।”[3] একমাত্র আল্লাহর কাছেই এ বেদনা জানানো যায়, তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী, তাঁরই উপর নির্ভরতা।”[4]

এ সকল যুগের ফকীহদের ভুলভ্রান্তি কিভাবে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি তৈরি করে সে প্রসঙ্গে আব্দুল হাই লাখনবী বলেন:

وكذلك مسألة الإشارة في التشهد فإن كثيراً من كتب الفتاوى متواردة على منعها وكرهاتها فيظن الناظرون فيها أنه مذهب أبي حنيفة وصاحبيه فيشكل عليهم الأمر بورود أحاديث متعددة قولية وفعلية تدل على جوازها وسنيتها قال علي القاري المكي في رسالته تزيين العبارة لتحسين الإشارة بعدما ذكر الأخبار الدالة على الإشارة: لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في هذه المسألة ولا في جواز الإشارة بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباه وكذا مالك والشافعي وأحمد وسائر علماء الأمصار والأعصار ... فلا اعتداد لما ترك هذه السنة الأكثرون من سكان ما وراء النهر وأهل خراسان والعراق وبلاد الهند ممن غلب عليهم التقليد وفاتهم التحقيق... وقد أغرب الكيداني حيث قال: والعاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة: كأهل الحديث أي مثل إشارة جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله ﷺ وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم ... ولو لا حسن

الظن به وتأويل كلامه بسبب لكان كفره صحيحا وارتداده صريحا فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت عن رسول الله ﷺ ما كاد أن يكون متواترا في نقله؟ فظهر منه أن قول النهي المذكور في الفتاوى إنما هو من مخرجات المشايخ لا من مذهب صاحب المذهب وقس عليه أمثاله وهي كثيرة... وإذا عرفت هذا فحينئذ يسهل الأمر في دفع طعن المعاندين على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم طعنوا في كثير من المسائل المدرجة في فتاوى الحنفية أنها مخالفة للأحاديث الصحيحة أو أنها ليست متأصلة على أصل شرعي ونحو ذلك وجعلوا ذلك ذريعة إلى طعن الأئمة الثلاثة ظنا منهم أنها مسائلهم ومذاهبهم وليس كذلك بل هي من تفرعات المشايخ استنبطوها من الأصول المنقولة عن الأئمة فوقعت مخالفة للأحاديث الصحيحة فلا طعن بها على الأئمة الثلاثة بل ولا على المشايخ أيضا فإنهم لم يقرروها مع علمهم بكونها مخالفة للأحاديث إذ لم يكونوا متلاعبين في الدين بل من كبراء المسلمين بهم وصل ما وصل إلينا من فروع الدين بل لم يبلغهم تلك الأحاديث ولو بلغت لم يقرروا على خلافها فهم في ذلك معذورون ومأجورون.

“এখানে একটি উদাহরণ সালাতের মধ্যে তাশাহুদের সময় ইশারা করা। হানাফী ফিকহের অনেক ফাতওয়ার গ্রন্থেই ইশারা করতে নিষেধ করা হয়েছে বা মাকরুহ বলা হয়েছে। পাঠকগণ মনে করবেন যে, এটিই ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর দু ছাত্রের মত। তখন বিষয়টি তার কাছে সমস্যা মনে হয়; কারণ অনেকগুলো হাদীস দ্বারা এরূপ ইশারা করা সুন্নাত বলে প্রমাণিত। মোল্লা আলী কারী ‘তায়য়ীনুল ইবারাতি লিতাহসীনি লি ইশারাতি’ পুস্তিকায় এ বিষয়ক হাদীসগুলো উল্লেখ করে বলেন: সাহাবীদের মধ্যে এবং পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে তাশাহুদের সময় ইশারা করার বৈধতার বিষয়ে কোনো মতভেদ ছিল না। আমাদের ইমাম আ’যম, তাঁর দু সঙ্গী (আবু ইউসূফ ও মুহাম্মাদ), ইমাম মালিক, শাফিয়ী, আহমদ এবং সকল দেশের ও সকল যুগের আলিমগণ এ মত পোষণ করেছেন। পরবর্তী যুগে পারস্য, মধ্য এশিয়া ও ভারতের অধিকাংশ হানাফী আলিম এ সুন্নাতটি বর্জন করেছেন। তাকলীদের প্রাধান্য ও গবেষণার অনুপস্থিতির কারণেই তারা এরূপ করেছেন। তাদের কর্ম ও মত গুরুত্বহীন ও অগ্রহণযোগ্য।

(নবম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা লুৎফুল্লাহ নাসাফী ফাযিল) কীদানী (৯০০ হি) অবাক ও উদ্ভট কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: ‘সালাতের মধ্যে হারাম কর্মগুলোর দশম কর্ম শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করা, যেভাবে আহলে হাদীসরা করে।’ (আলী কারী বলেন:) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীস বিষয়ক জ্ঞান যাদেরকে একত্রিত করেছে তারা যেভাবে ইশারা করেন সেভাবে ইশারা করা হারাম। এটি তাঁর একটি ভয়ঙ্কর ভুল ও কঠিন অপরাধ। তাঁর বিষয়ে সুধারণা না থাকলে এবং তাঁর কথার ব্যাখ্যা না করলে তার এ কথাটি সন্দেহাতীত কুফর এবং সুস্পষ্ট ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হতো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে হারাম বলা কোনো মুমিনের জন্য কি বৈধ হতে পারে? বিশেষত যে বিষয়টি প্রায় মুতাওয়াতির?...”

লাখনবী বলেন, এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ফাতওয়ার গ্রন্থসমূহে এরূপ ইশারা করতে নিষেধ করে যে মত উল্লেখ করা হয়েছে তা পরবর্তী যুগের ফকীহগণের মত মাত্র; তা ইমাম আবু হানীফার মাযহাব নয়। আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যা অবিকল এরূপ।... ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের বিষয়ে বিরোধীরা যে অভিযোগ করেন তার স্বরূপ বুঝা এখন সহজ হয়ে গেল। হানাফী ফাতওয়া বা ফিকহের গ্রন্থে অনেক মাসাইল রয়েছে যেগুলো সহীহ হাদীসের বিপরীত বা কোনো প্রসিদ্ধ শরয়ী মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। বিরোধীরা এ সকল মাসআলাকে ইমাম ত্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁরা ধারণা করেন যে, এগুলো বোধ হয় ইমাম আবু

হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদের মত। প্রকৃতপক্ষে এগুলো তাঁদের মত নয়। এগুলো পরবর্তী যুগের হানাফী ফকীহগণের মত। তাঁরা ইমামগণ থেকে বর্ণিত মূলনীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে এ সকল মত প্রকাশ করেছেন। এগুলোর জন্য ইমামত্রয়কে অভিযুক্ত করা যায় না। এমনকি পরবর্তী ফকীহগণকেও এজন্য অভিযুক্ত করা যায় না। কারণ তাঁরাও জেনেশুনে হাদীস বিরোধী ফাতওয়া দেন নি। তাঁরা দীন নিয়ে তামাশা করতেন না; বরং তাঁরা মুসলিমগণের নেতৃপরিষদের আলিম ছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমেই আমরা দীনের মাসআলাগুলো জানতে পেরেছি। মূলত পরবর্তী এ সকল ফকীহ এ বিষয়ক হাদীসগুলো জানতেন না। যদি তাঁরা এ সকল মাসআলায় হাদীস জানতেন তবে হাদীসের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিতেন না। কাজেই তাঁরা মাযুর ছিলেন এবং ভুল ইজতিহাদের জন্য সাওয়াব পাবেন।...”[5]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবু হানীফা হাদীস বিরোধী কিয়াসের প্রবর্তক ছিলেন না। সহীহ হাদীসের উপর নির্ভরতার পাশাপাশি তিনি ফকীহের মত যাচাই করে গ্রহণের তাকীদ দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহগণ এবং অন্যান্য মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণও একই নির্দেশনা দিয়েছেন। তাকলীদ ও দলীল নির্ভরতার এ সমন্বয়ই সাহাবীগণের সূনাত। একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

মদীনার কিছু মানুষ ইবন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করেন: ফরয তাওয়াফের পরে যদি কোনো মহিলার হয়েয (ঋতুস্রাব) শুরু হয় তবে কী হবে? তিনি বলেন: উক্ত মহিলা (বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়াই) দেশে ফিরে যাবে। তখন তাঁরা বলেন: যাইদ ইবন সাবিত (রা)-এর মতে উক্ত মহিলা হয়েয শেষ হওয়ার পর বিদায়ী তাওয়াফ করে দেশে যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: মক্কা ত্যাগের আগে হাজীকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। আমরা যাইদ (রা)-এর মত বাদ দিয়ে আপনার মত গ্রহণ করব না। তখন ইবন আব্বাস (রা) বলেন: আপনার যখন মদীনায় পৌঁছাবেন তখন আমার মতের হাদীসটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। তাঁরা মদীনায় পৌঁছে উম্মু সুলাইম (রা) ও অন্যান্য সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা হাদীসটি বলেন। ঘটনাটি হলো, বিদায় হজ্জে ফরয তাওয়াফের পর সাফিয়াহ (রা)-এর হয়েয শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়াই মক্কা ত্যাগের অনুমতি দেন। তখন মদীনাবাসীগণ ইবন আব্বাস (রা)-এর মত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে জানান যে, হাদীসটি তাঁর বর্ণনা মতই তাঁরা পেয়েছেন।[6]

সাহাবীগণের যুগের এ ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানছি:

- (১) মুসলিমদের দায়িত্ব প্রাজ্ঞ আলিমদের থেকে দীন জেনে নেওয়া। এক্ষেত্রে একজন আলিমের প্রতি অধিক আস্থা থাকা খুবই স্বাভাবিক। যাইদ (রা)-এর প্রতি অবিচল আস্থার কারণে ইবন আব্বাস (রা)-এর মুখে হাদীসটি শুনে তাঁরা মেনে নেন নি।
- (২) মদীনাবাসীদের কথার প্রতিবাদে ইবন আব্বাস (রা) তাদেরকে হাদীস বিরোধী বলে অভিযুক্ত করেননি। তাঁর বর্ণনা মেনে নিতেও তাদেরকে চাপাচাপি করেননি। তিনি তাঁদেরকে হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে উৎসাহ দিয়েছেন।
- (৩) মদীনাবাসীগণ যাইদ (রা)-এর উপর আস্থার কারণে ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসটি বিভিন্ন অজুহাতে বাতিল বলে থেমে থাকেন নি। তাঁরা হাদীসটির বিষয়ে অনুসন্ধান করে ইবন আব্বাসের (রা) বর্ণনার নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন।

এটিই তাকলীদ ও দলীল অনুসন্ধানের মাসনূন আদর্শ। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে সাধারণ মুমিন ফকীহগণ

থেকে দীন জানবেন। এক্ষেত্রে কোনো একজন ফকীহের উপর অধিক আস্থাশীল হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, সকল ফকীহ বা মুহাদ্দিসের মত সমানভাবে গ্রহণ করলে বা ইচ্ছামত গ্রহণ করলে সাধারণ মুমিনকে বিভ্রান্ত হতে হবে। তবে এরূপ আস্থা বা তাকলীদ অর্থ নির্বিচার বা অন্ধ অনুসরণ নয়। মুমিনের দায়িত্ব বিপরীত কোনো হাদীস জানা গেলে তার নির্ভুলতার বিষয়ে অনুসন্ধান করা। অনুসন্ধানের মাধ্যমে যদি প্রমাণ হয় যে, তিনি যে ফকীহের অনুসরণ করেন তার মতের বিপরীত হাদীসটি বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও ব্যাখ্যাশীল তখন তিনি তা গ্রহণ করবেন।

“যখন কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণ হয়” বলতে ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য ইমাম বাহ্যত এ অবস্থা-ই বুঝিয়েছেন। কোনো একটি হাদীসকে কোনো নির্দিষ্ট আলিম সহীহ বলেছেন বলে জানা এবং নিজে অনুসন্ধানের মাধ্যমে হাদীসটি সহীহ, ব্যাখ্যাশীল ও নিজের পালনীয় মতের দলীলের চেয়ে শক্তিশালী বলে নিশ্চিত হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। কোনো আলিমের উপর নির্ভর করে কোনো হাদীসকে সহীহ বলে গ্রহণ করা ফিকহী তাকলীদের মতই তাকলীদ। এটি নিন্দনীয় নয়। তবে এরূপ তাকলীদের উপর নির্ভর করে অন্য তাকলীদ খণ্ডন বা বর্জন করা যায় না। বুখারী, মুসলিম, ইবন হাজার, সুয়ুতী, আলবানী বা অন্য কোনো মুহাদ্দিস (রাহিমাহুল্লাহ) একটি হাদীসকে সহীহ বলেছেন বলে উক্ত হাদীসের বিপরীত কর্মকে বাতিল বলে মনে করা বিভ্রান্তিকর। আবার আবু হানীফা, শাফিয়ী, আহমদ, মালিক, আওয়ামী, তাহাবী বা অন্য কোনো ফকীহ (রাহিমাহুল্লাহ) একটি কর্মকে সঠিক বলেছেন বলে উক্ত মতের বিপরীত হাদীসকে রহিত, বাতিল, দুর্বল ইত্যাদি বলে উড়িয়ে দেওয়াও একইরূপ বিভ্রান্তিকর।

বিশেষত মুফতী ও আলিমের দায়িত্ব তাঁর ফাতওয়ার দলীলটি ভালভাবে জানা। একজন ফকীহ বা মুহাদ্দিসের উপর আস্থার কারণে ফিকহ বা হাদীস বিষয়ে তাঁর মতের উপর নির্ভর করা সাধারণ মুসলিমদের জন্য স্বাভাবিক। তবে অন্য কাউকে এ বিষয়ে ফাতওয়া বা সিদ্ধান্ত দিতে হলে বিষয়টি অধ্যয়ন করতে হবে। এরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস, সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত, একাধিক হাদীস থাকলে একটিকে গ্রহণ করার কারণ ভালভাবে জানতে হবে। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ছাত্রগণ এ বিষয়টির প্রতি সর্বোচ্চ তাকিদ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ ইমাম আবু হানীফা এবং উম্মাতের সকল ফকীহকে রহমত করুন এবং সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রদান করুন।

ফুটনোট

- [1] ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হয় ৪৮৮হি/১০৯৫খৃ, তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন ৬৫৬ হি/১২৫৮ খৃস্টাব্দে।
- [2] মুহাম্মাদ খাদমী, বারীকাহ মাহমুদিয়াহ ১/১৬৮। আরো দেখুন: ১/৩৬৭, ২/৪৬৪, ৪/১০৫।
- [3] সূরা (৪৩) যুখরুফ: ২৩ আয়াত।
- [4] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/৩২৪।
- [5] আব্দুল হাই লাখনবী, আন-নাফিউল কাবীর (আল-জামিউ সগীরসহ), পৃ. ৭।

[6] বুখারী, আস-সহীহ ২/৬২৫; ইবন হাজার, ফাতহুল বারী ৩/৫৮৮; আইনী, উমদাতুল কারী ১৫/৩৫১-৩৫২।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7071>

হাদিসবিভিন্ন প্রজেক্টে অনুদান দিন